বিবেকমানস

নারীমুক্তি : স্বামীজীর দৃষ্টিতে

সুব্রতা সেন

স্বামী বিবেকানন্দের নারীমুক্তিভাবনায় নারীর বহিরঙ্গ মুক্তি ও অন্তরঙ্গ মুক্তি—উভয়ই স্থান পেয়েছে। 'মুক্তি' শব্দটি বহিরঙ্গে নির্দেশ করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে বৈষম্য ও নিপীড়নের বন্ধন থেকে মুক্তি, যাতে সমাজের যেকোনও ব্যষ্টিসত্তা ও সমষ্টিসত্তা তার পরিমণ্ডলে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা পেতে পারে। অন্তরঙ্গ মুক্তির অর্থ হল—চিন্তার স্বচ্ছতা, গভীরতা ও ব্যাপকতা, যার অনুশীলনে একজন মানুষ স্বাধীনচিত্ত হয়ে গড়ে উঠে নিজের জীবনের সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব নিজে নিতে পারে, পারে সর্ববিধ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং হতাশাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সমাধানের পথ নিজেই খুঁজে বার করতে।

বস্তুতপক্ষে মনের প্রকৃত মুক্তি হল এক উজ্জ্বল অনুভব, যা পরিণামে নিজের অনন্ত স্বরূপের সন্ধান দেয়, ঘুচিয়ে দেয় 'আমি' ও 'আমার' এই ক্ষুদ্র গণ্ডির সীমাবদ্ধতা। সংগতভাবেই তাই স্বামী বিবেকানন্দের কাছে মুক্তির অর্থ সর্ববিধ স্বাধীনতা ও অনন্ত শক্তির উদ্বোধন। তিনি বলেছেন, ''মুক্তি যা আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থ—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সবরকমের স্বাধীনতা।'' একমাত্র যথার্থ শিক্ষাই পারে একজন নারী বা পুরুষকে সর্বাত্মক মুক্তির আস্বাদন করাতে। স্বামীজীর ভাষায়, ''যে-শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।'' ''মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই বর্তমান, তাহারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা।''

সারা ভারত পরিক্রমা করে স্বামীজী বেদনার্ত হৃদয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, ''ভারতের দুই মহাপাপ মেয়েদের পায়ে দলানো আর জাতি, জাতি করে গরিবদের পিষে ফেলা।'' তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে স্বামীজী এই দুই পাপ থেকে দেশকে ত্রাণ করার চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করেছেন।

পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর কারণে ভারতীয় নারী অন্যদেশের নারীর মতোই পরতন্ত্র হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। তার উপর ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করায় বিজাতীয় ভাব সংক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে মধ্যযুগ থেকেই নানা নিয়মের নিগড়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে হিন্দুসমাজকে তার মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়িত হয়েছে নারীরা। নারী অরক্ষণীয়া, বিবাহই তার একমাত্র বৈদিক সংস্কার, কৌলীন্যপ্রথার অপব্যবহারে একদিকে অধিকবয়স্ক পুরুষেরও বহুবিবাহ উৎসাহিত, অন্যদিকে শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত নারীর বাল্যবিবাহ, ফলে অকালবৈধব্যের গ্লানি, অশনে-বসনে-লোকব্যবহারে অতিকঠোর নিয়ন্ত্রণ যা প্রকৃতপক্ষে নির্যাতনের নামান্তরমাত্র। পরিস্থিতির চাপে হীনম্মন্য নারীর বৈধব্যদশায় স্বজনগৃহে আক্ষরিক অর্থেই দাসীবৃত্তি অথবা সহমরণ বরণ করে দেবীত্বে উন্নীত হওয়া—উনিশ শতকের আরম্ভ পর্যন্ত এই ছিল হিন্দুনারীর জীবনালেখ্য।

এই কালে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি যে কেবল উপেক্ষিত তাই নয়, রক্ষণশীল মহল এর ঘোর বিরোধী। যে-অদ্ভুত প্রচারে সমকালীন সমাজগগন মুখরিত তা হল, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে, নাটক-নভেল পড়ে অসৎচরিত্রা হয়ে উঠবে। গৃহের সকল পুরুষই যেন নারীর অভিভাবক। তাদের রক্তচক্ষুর সতর্ক পাহারা এড়িয়ে নারীর লেখাপড়া শেখার গোপন প্রয়াসটুকু কোনওক্রমে প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাকে রীতিমতো উচ্ছৃঙ্খলতা বলে গণ্য করা হয়েছে। আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায় স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি তরুণবয়সে সমাজের প্রাগ্রসর, হৃদয়বান পুরুষগণের এবং ব্রাহ্মসমাজের নারীকল্যাণমূলক নানা সংস্কারের দিকে পড়েছিল। আমরা দেখছি ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দেই আইনত নিষিদ্ধ হয়েছে সতীপ্রথা। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ প্রবর্তিত হয়েছে। নারীর বাল্যবিবাহ রোধ ও স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে শহর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে বেথুন স্কুল, ক্রমে আরও কয়েকটি নারী শিক্ষালয়। বলা বাহুল্য, শহর কলকাতার নারী উন্নয়নের ক্ষীণ রশ্মিটুকু প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছায়নি। তবু আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করতেই হয়, মুষ্টিমেয় হলেও ভারতীয় নারীসমাজ প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের দাক্ষিণ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম আলোর চরণধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। পারিবারিক ও সামাজিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের বাধা অতিক্রম করে নারীসমাজের জন্য কিছু করার অবস্থায় তখনও তারা ছিল না।

পাশ্চাত্য জগতের নারীজাগরণের ক্ষেত্রে কিন্তু সেদেশের নারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের কালে 'মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা'—এই মত প্রবল হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের মেয়েরা, সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যে পীড়িত ছিলেন ঠিকই কিন্তু ভারতীয় নারীদের মতো বাল্যবিবাহ, বৈধব্যের যন্ত্রণা ও সতীদাহের তুল্য কোনও নিষ্ঠুর প্রথার শিকার তাঁদের হতে হয়নি। পারিবারিক জীবনেও অতখানি গৃহবন্দি তাঁরা ছিলেন না। সুতরাং সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইংল্যান্ডে Wollstonecraft-এর মতো নারীর অভাব হয়নি, যিনি 'নারীও পুরুষের মতো নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ করবে'—এই দাবি তুলে ধরতে পেরেছিলেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে Wollstonecraft, 'A Vindication of the Rights of Women' রচনা করেন। গ্রন্থটিকে নারী-পুরুষের সাম্যবাদমূলক প্রথম রচনা বলে গণ্য করা হয়।

নারীজাগরণের দৃষ্টিকোণ থেকে অষ্টাদশ শতককে 'The Age of Enlightenment' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্যে আসেন। ১৭৯২ থেকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই একশো বছরে পাশ্চাত্যের নারীরা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং কয়েকটি অধিকার অর্জন করতে সমর্থ হন। সবকটি আন্দোলনের মধ্যে নারীদের লক্ষ্য ছিল কেবল নারী হিসেবে নয়, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি-মানুষরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে দাসপ্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। নারীবাদী মহিলারা এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে দেন কারণ তাঁদের মনে হয়েছে, ক্রীতদাসদের প্রভুর এবং সংসারে স্বামীর মানসিকতার মধ্যে তেমন কোনও তফাত নেই; দাস ও পত্নীকে একধরনের আধিপত্যের অধীনস্থ হয়েই থাকতে হয়, যদিও তথাকথিত স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামভোগের ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য দুস্তর। ১৮৪০-এ ইংল্যান্ড ও আমেরিকার নারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলে নারী আন্দোলন একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করে। ১৮৪৮-৪৯-এ কয়েকটি কলেজ মেয়েদের প্রবেশাধিকার দিতে রাজি হয়। Emily Davies ও Leigh Smith মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান খোলেন। ক্রমে মেয়েরা চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগেও প্রবেশাধিকার অর্জন করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে Caroline Norton-এর প্রচেষ্টায় বিবাহবিচ্ছিন্না নারী ও তাদের সন্তান সম্পর্কিত কিছু সমস্যার সমাধান হয়। নারীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য স্থাপিত হয় 'Society for Promoting the Employment of Women' (SPEW); নানাস্থানে

এর শাখা প্রসারিত হয়ে নারীর অর্থনৈতিক প্রয়োজন খানিকটা মেটাতে থাকে।

বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় হল, একালের নারীবাদীরা গির্জা তথা পিতৃতান্ত্রিক যাজককুলকে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বাধা বলে মনে করেছেন। কারণ তাঁদের উপর যাজকদের চাপিয়ে দেওয়া দায় অনুযায়ী আদিম মানবী ইভের প্রথম পাপের উত্তরাধিকার আজীবন বইতে হবে সর্বকালের খ্রিস্টান নারীসমাজকে। এই দায় অস্বীকার করার জন্য দুই নারীবাদী মহিলা, Stanton ও Gage সংকলন করলেন 'Women's Bible'। এছাড়াও Stanton লিখলেন 'The Matriarchate or Mother Age' অর্থাৎ মাতৃতন্ত্রের উপর বই আর Gage লিখলেন 'Woman, Church and the State'। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই বিদ্রোহ-জাগানো রচনা।

তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করলে স্বীকার করতেই হয়, গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় উনিশ শতকে আমেরিকার মেয়েদের অগ্রগতি হয়েছে অনেক বেশি। আমেরিকার মেয়েরা যেকালে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও স্বনির্ভরতার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময়ী, সেইকালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশ্বমেলার অঙ্গীভূত বিশ্বধর্মমহাসভার মহামঞ্চে ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য আবির্ভাব। উনিশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মানুষের উন্নতির বিচিত্র নিদর্শন দেখে বিস্মিত স্বামীজী দশদিন ধরে মেলাপ্রাঙ্গণ পরিক্রমা করেছিলেন; আরও যে-বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল তা হল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মেয়েদের নানাধরনের হস্তশিল্পপ্রদর্শনী। খুবই উল্লেখযোগ্য যে সুনির্মিত মহিলাভবন ও প্রদর্শনী—উভয়ই ছিল, নারীসমাজের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ প্রয়াসের ফল। মেয়েদের শিল্পচেতনা, প্রয়োগনৈপুণ্য ও সংগঠন প্রতিভার পরিচয় পেয়ে স্বামীজী উপলব্ধি করলেন, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে মেয়েরা স্বাধীনভাবেই নিজেদের সব সমস্যা মেটাতে পারবে। এদের দেখে এবং উত্তরকালে বিভিন্ন পরিবারে বাস করার সুবাদে আমেরিকার মেয়েদের স্বাধীনতা, পবিত্রতা, শিক্ষা ও সর্ববিধ নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, ''এইরকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরি করতে পারি তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব।''

ধর্মমহাসভা শুরু হবার প্রায় সাড়ে চার মাস আগে মেলাপ্রাঙ্গণে মহিলা বিভাগের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। এই উপলক্ষ্যে সভানেত্রী পটার পামার যে-প্রদীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন সেই বক্তব্য অনুধাবন করলে বোঝা যায়, বিধির বিধানে আমেরিকার নারীরা স্বামীজীর ভাব নেবার জন্য কতখানি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। পামার বলেছিলেন—এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সমগ্র বিশ্বের নারীসমাজের মধ্যে ভাব বিনিময়, মেয়েদের স্বনির্ভরতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। নারী গৃহাঙ্গনেই শোভা পাবে, বাইরের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তাদের মানায় না—পুরুষদের এই অভিমত দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য হতে পারে না। তথাকথিত নারীপূজার তত্ত্ব অবাস্তব ও অসংগত। এতে নারীর মর্যাদা আদৌ রক্ষিত হয় না। স্বামীজী নিজেও নারীজাতির প্রতি ছেলেদের পুরুষসুলভ সৌজন্য বা gallantry প্রকাশে এবং এতে নারীদের আত্মপ্রসাদে বিশেষ বিরক্ত বোধ করতেন; কারণ এই মনোভাবের প্রশ্রয় দিলে মেয়েরা পুরুষের কাছে খেলার পুতুলের মতোই হয়ে থাকবে। স্বামীজী চাইতেন, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ মন থেকে মুছে ফেলে মানুষ হিসেবে উভয়ে মেলামেশা করুক।

পামার সেদিন আরও বলেছিলেন : বর্তমান যুগ ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও বিকাশের জয়গান করে, কাজেই নারীরা তাদের গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে চাইলে তাদের কোনও যুক্তিতেই বাধা দেওয়া চলে না।

বহির্জীবনে ও গার্হস্থ্যজীবনে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নারী যাতে তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেজন্য এই নারীসম্মেলন উপযুক্ত। পামার স্পষ্টভাবে বলেছেন : আধুনিক যুক্তিবাদের যুগে যুক্তিহীনা, অমিতব্যয়িনী ও স্বেচ্ছাচারিণী গৃহিণী বা জননীর কোনও স্থান নেই। এই সম্মেলন বিশ্ববাসীর মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে চায় যে, ক্ষমতা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষে কোনও ভেদ নেই। সুযোগ,

উৎসাহ ও আনুকূল্য পেলে উভয়েই সমাজের প্রয়োজনীয় হয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন।

মেলার প্রদর্শনীতে প্রাচ্যদেশ থেকে মাত্র জাপান ও শ্যামদেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ভারতীয় নারীদের একাংশ চারদশক আগে শিক্ষার সুযোগ পেলেও এবং ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন শিল্পে নৈপুণ্য অর্জন করলেও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোনও প্রতিষ্ঠান তখনও গড়ে তুলতে পারেননি। কাজেই ধর্মমহাসভা চলাকালে শ্রীমতী পামার মহিলাভবনে যখন স্বামীজীকে ভারতীয় নারী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানালেন তখন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ কার্যত হয়ে দাঁড়ালেন ভারতীয় নারীসমাজের মুখপাত্র। স্বামীজী তাঁর ওই অসাধারণ বক্তৃতায় জয়গান করলেন যথার্থ প্রগতিশীল নারীসমাজের এবং দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—পূর্ণ নারীত্বের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা। একইসঙ্গে তিনি তুলে ধরলেন ভারতীয় নারীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ 'পবিত্রতা'র কথা। নারীর পবিত্রতার উপরই নির্ভর করে পারিবারিক জীবনযাত্রার ছন্দোময় আবর্তন। আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ ভারতীয় নারীর ভাব রক্ষা করে যদি তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন করা যায় তাহলে তারাই হবে জগতের আদর্শ নারী। স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতে চরিত্রবতী, শিক্ষিতা, ত্যাগব্রতী ব্রহ্মচারিণীগণ গ্রামে নগরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলে নারীশিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার ঘটাবেন। স্বামীজী বলেছেন : ''দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।''

বস্তুতপক্ষে স্বামীজীর বক্তব্যে ভবিষ্যৎ ভারতীয় নারীচরিত্রের রূপরেখাই কেবল যে অঙ্কিত হল তাই নয়, পাশ্চাত্য নারী আন্দোলনেও একটি নতুন মাত্রা সংযুক্ত হল। বহিরঙ্গ বন্ধনমুক্তির যুক্তিনিষ্ঠ আন্দোলনের অন্তরঙ্গে পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার বল সঞ্চারিত হলে তবেই আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে মুক্ত নারী তার অর্জিত মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখতে পারবে। এইদিকে ইঙ্গিত দিয়ে স্বামীজী আমেরিকার মেয়েদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নারীর ভাবসম্মিলনের মধ্য দিয়েই রূপায়িত হবে ভাবী কালের আন্তর্জাতিক নারীচরিত্র। অর্থাৎ স্বামীজী চেয়েছেন ভারতীয় নারীর আধ্যাত্মিকতা তথা আন্তর মুক্তির ভাবে পাশ্চাত্য নারী আন্দোলন সঞ্জীবিত হোক আর ভারতীয় নারীরা লাভ করুক উপযুক্ত শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পূর্ণ সুযোগ, যাতে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে।

স্বামীজীকে দেখবার আগে আমেরিকার নারীরা ভাবতেও পারেননি কোনও ধর্মগুরু আদিম পাপের কথা না শুনিয়ে তাঁদের অমৃতের সন্তানরূপে অভিনন্দিত করতে পারেন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন, যিনি এমন এক সার্বজনীন ধর্মমত প্রচার করেন যেখানে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ—সকলের জন্য সমান জায়গা আছে। বেদান্তের আত্মতত্ত্ব আমেরিকার মেয়েদের কাছে চরম সাম্যবাদ ও পরম স্বাধীনতার বার্তা বহন করে আনল। ফলত এই মেয়েরা ভারতীয় নারীর আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে ভারতীয় মেয়েদের ইহজীবনের উপযোগী শিক্ষা ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে অনুপ্রাণিত বোধ করলেন।

ভারতীয় নারীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্পর্কে যা স্বামীজী ওদেশে বলেছিলেন তার চরম পরাকাষ্ঠা শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর চরণপ্রান্তে এসে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে ধন্য হলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আভিজাত্যে অগ্রগণ্য, নানাগুণিজনসান্নিধ্যের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ইংল্যান্ড ও আমেরিকার তিন নারী—মার্গারেট নোবল, সারা বুল ও জোসেফিন ম্যাকলাউড। ধীর, স্থির, বিদুষী সারা শ্রীশ্রীমায়ের অনাড়ম্বর ঘরখানিতে ঢুকেই অনুভব করলেন এক জমাটবাঁধা পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডল, যা একাধারে সম্ভ্রম জাগায় ও অন্যদিকে অনাস্বাদিতপূর্ব এক ভালোবাসার মাধুর্যে মুহূর্তমধ্যে সকলকে একেবারে আপন করে নেয়। ভারতীয় নারীর আদর্শস্বরূপা শ্রীশ্রীমা তাঁদের বিস্মিত করলেন তাঁর স্বাধীনচিত্ততা, বিচারশীলতা ও যুক্তিনিষ্ঠায়, যখন

''গুরুর প্রতি আনুগত্য বলতে কী বোঝায়?''—সারার এই প্রশ্নের উত্তরে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে মা বললেন, ''আধ্যাত্মিক বিষয়ে গুরুর সব কথা শুনতে ও মানতে হবে, কিন্তু ঐহিক ব্যাপারে নিজের সদ্‌বুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে হয়, সে-কাজ গুরুর অনুমোদিত না হলেও।''

উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটেনে New Women বলে পরিচিত নারীরা বিদ্রোহ করেন পারিবারিক ও আর্থসামাজিক জীবনে পুরুষের আত্মম্ভরিতা, আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে। পতিপ্রধান বিবাহবন্ধন মেনে কেবল সংসার সামলানো ও সন্তান পালনের মতো কাজের বাঁধাধরা গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে তাঁরা রাজি নন। এঁদের ওপর একতরফাভাবে চাপানো ভিক্টোরিয়া যুগের নীতিবোধেরও তাঁরা নিন্দা করেন। এঁদের বিষয় স্বামীজী জানতেন, নিবেদিতাও জানতেন। নিন্দা না করে নিবেদিতা বরং তাঁর লেখায় সেই নারীদের গুণগান করেছেন যারা নিজেদের ভালোবাসা ও সেবা দিয়ে সুখী ও সুন্দর সংসার রচনা করতে সক্ষম।

স্বামীজীর প্রয়াণোত্তর কালে নারীমুক্তি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিতে বিভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে হবে। নারীবাদীদের একাংশ সংশোধনবাদী। স্বামীজী অবশ্যই এঁদের দাবিগুলি সমর্থন করতেন। এই নারীরা চেয়েছেন পারিবারিক জীবনের দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে পতি ও পত্নী উভয়েই সমান অংশীদার হোন। সমাজে পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে Non-Sexist Child Rearing-এর কথা বলা হয়েছে। এর একটা ভালো দিক আছে। নারী বা পুরুষ হিসেবে বড়ো না হয়ে শিশু যদি মানুষ হিসেবে বড়ো হয়, তাহলে তার পক্ষে বেদান্তের আত্মতত্ত্ব অন্তত theoritically ধারণা করা সম্ভব হবে। এই নারীবাদীরা আর্থসামাজিক জীবনে পুরুষের মতো নারীর সমান মর্যাদা ও নিরাপত্তা, একই ধরনের শ্রমে একই রকম মজুরি এবং গৃহের শ্রমকে Productive labour হিসেবে স্বীকৃতি চেয়েছেন, যাতে সাধারণ পরিবারে একজন উদয়াস্ত পরিশ্রম করা গৃহবধূকে বাইরে অর্থ উপার্জন না করার জন্য পরিবারের ভার বলে গণ্য না করা হয়। পৃথিবীর সবদেশে এই দাবিগুলি স্বীকৃত হলে, সন্দেহ নেই, নারীর অবস্থা কিছু ফিরবে।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে New Womenদের চেয়েও উগ্রপন্থী নারীদের আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজজীবনে এঁদের প্রভাবও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। এঁদের বক্তব্য হল, পুরুষের অনৈতিক যথেচ্ছ জীবন, সমাজ আগাগোড়াই মেনে নিয়েছে আর নারীর উপর কেবলই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এসেছে। এই বিদ্রোহী নারীরা ঘোষণা করে যে তাদেরও পুরুষদের মতো যথেচ্ছ জীবন যাপনের অধিকার আছে এবং এ-ব্যাপারে সমাজের নিয়ন্ত্রণ মানতে আর তারা রাজি নয়। এইরকম সমাজবিধ্বংসী সর্বনাশা আন্দোলন স্বামীজী কেন, কেউই সমর্থন করতে পারেন না। পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিশোধ নিতে নিজেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়া—এ যেন চলতি বাংলা প্রবাদের ভাষায়, 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা!' মেয়েরা কি পারে না 'Men's Restraint'-এর জন্য আন্দোলন করে উচ্ছৃঙ্খল পুরুষদের সংযত জীবনযাপনে বাধ্য করতে!

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের অন্যতম মূল কথা, সন্ন্যাসজীবনে কামকাঞ্চন ত্যাগ ও গৃহস্থের জীবনে তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং নারীমাত্রকেই মাতৃভাবে সন্দর্শন। দুশো বছরও হল না আমরা ভারতীয়রা সব ভুলে গেলাম! পাগলের মতো পাশ্চাত্যের কতকগুলি অর্থহীন প্রথার অনুকরণ করে করে স্বাধীন ভারতবাসী কার্যত পরাধীন হয়েই রইলাম। কতদিন আগে স্বামীজী খেদের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন : ''হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ এমনই হইতেছে যে ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধিবিচারশাস্ত্র বা বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের যে আচারের প্রশংসা করে তাহাই ভালো, তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?''

বর্তমানে কোনও কোনও প্রগতিশীল ভারতীয় নারী অনুধাবন করেছেন, আধুনিক নারীমুক্তি আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে সম্পূর্ণ বিদেশি আদলে। কাজেই এর

মধ্যে দেশজ বৈশিষ্ট্য কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাশ্চাত্য নারীবাদীরাও এদেশের নারীবাদীদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখছেন না। তাঁরা মনে করছেন, ভারতীয় নারীরা পশ্চাৎপদ, অজ্ঞ ও প্রাচীনপন্থী (backward, ignorant and tradition bound)।

প্রশ্ন হচ্ছে, পাশ্চাত্য নারীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার জন্য আমরা আমাদের ঐতিহ্য থেকে আর কতদূরে সরে যাব আর কেনই বা যাব? তাঁরা তাঁদের অতিপ্রগতিশীলতার দ্বারা কোথায় পৌঁছেছেন? পারস্পরিক স্পর্ধিতায় যথেচ্ছাচার করার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে আজ অজস্র broken family। মানসিক নিরাপত্তার অভাবে অস্থির, বিক্ষুব্ধ, হতাশাগ্রস্ত, সন্দিগ্ধ ও অপরাধপ্রবণ বেপরোয়া তরুণ প্রজন্ম ধনী দেশগুলির এক ভয়াবহ সমস্যা। তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে সেই সমস্যা কি ভারতীয় সমাজে প্রবলভাবে সংক্রামিত হচ্ছে না? আর 'বিশ্বায়ন,' 'উদারীকরণ' ইত্যাদি গালভরা নামের দোহাই দিয়ে আমরা কি এই সংক্রমণের আনুকূল্য করছি না?

ঠাকুরের একশো পঁচাত্তর এবং স্বামীজীর দেড়শো বছরের পূর্তিউৎসব কি আমরা কেবল ফুল, মালা, আলোকসজ্জা, প্রদর্শনী ও সেমিনার দিয়েই সমাপ্ত করব? যে-কামকাঞ্চন ত্যাগ ও সেবার আদর্শ তাঁরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন, মোহান্ধ হয়ে আমরা ঠিক তার বিপরীত দিকেই ছুটছি। আমাদের 'মান হুঁশ' হবার তাগিদ আসছে কই? শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী মানুষের সংখ্যা তো বড়ো কম নয়! আমরা কি পারি না আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবন স্বামীজীর বলিষ্ঠ চেতনায় সঞ্জীবিত করতে? খুব বড়ো কিছু নয়, আমরা যদি প্রত্যহ সামান্য সময়ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বামীজীর বাণী পাঠ ও আলোচনা করি তাহলে অল্পবয়স থেকে স্বামীজীর সদর্থক (positive) ভাবগুলি তাদের ভিতরে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হবে। ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা দিগ্‌ভ্রান্ত হবে না বা জীবনসমস্যায় বিপর্যস্ত বোধ করবে না। ক্রমে এই পারিবারিক পাঠচক্র ছড়িয়ে দিতে হবে প্রতিবেশীদের মধ্যে। পরিবারের ও প্রতিবেশীর জীবনে চলার পাথেয় জুগিয়ে দেওয়া কম মূল্যবান সেবা নয়।

শ্রীশ্রীমায়ের অতিপ্রিয় সন্তান স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী বলতেন, ''অনেক তো হল, পার তো একটা জীবন দেখাও।'' জীবন দেখানোর অর্থ বিখ্যাত হওয়া নয়। প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শকে লক্ষ্যরূপে স্থির করে নিষ্ঠা নিয়ে জীবনযাপন করা। অধিকারিভেদ অনুসারে সব জীবনের আলো হয়তো সমানভাবে বিকীর্ণ হবে না কিন্তু আন্তরিক প্রয়াসে নিজ জীবনে আলো জ্বালতে পারলে নিজের জীবন ধন্য হবে, অপরেও প্রেরণা পাবে। সমাজে যখন অনেক আলো নিভে যাচ্ছে, একটি আলোরও যে তখন বিপুল প্রয়োজন!

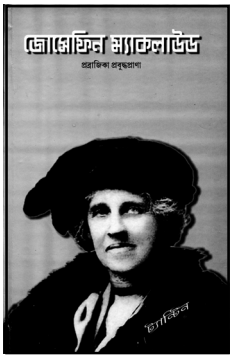

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হয়েছে

জোসেফিন ম্যাকলাউড

প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার সাড়া জাগানো 'Tantine : the Life of Josphine MacLeod' গ্রন্থের সুখপাঠ্য, প্রাঞ্জল অনুবাদ করে বাঙালি পাঠকদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন সুলেখক শ্রীস্বরাজ মজুমদার ও শ্রীমতী মিতা মজুমদার। সাদা-কালো ও রঙিন বহু আলোকচিত্র বইটির অন্যতম আকর্ষণ। মূল্য : ১২০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ, সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন কার্যালয়, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)